BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2bg4
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 29-38

বয়ঃসন্ধির ট্রানজিট পিরিয়ডঃ প্রসঙ্গ অসমিয়া ঔপন্যাসিক ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার কিশোর উপন্যাস 'মরমর দেউতা'

জাহ্নবী দাশ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য

জাহ্নবী দাশ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
লামডিং কলেজ, অসম, ভারত
e-mail: dbjjahnabi@gmail.com

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত
e-mail : brjsanjay24×7@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ছোটদের পৃথিবীটা যেহেতু বড়োদের মতো কূট– কাচালিময় নয়, তাই তাদের বিশ্বাসের জগতটাও অত্যন্ত গভীর। নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন তাদেরও আছে। বড়োদের চেয়ে আলাদা হলেও যুক্তি বা বুদ্ধি তাদের নেই এটা ভেবে নেওয়াটা মারাত্মক অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়। যেহেতু ছোটদের মন ভীষণ নরম-সরম, যেমন খুশি তাদের গড়ে তোলার একটা সুযোগ থেকেই যায়। এই মন ও চিন্তন সঠিকভাবে গড়ে তোলার অনেকটা দায়িত্ব বর্তায় শিশু সাহিত্যের ওপর। অসমিয়া উপন্যাস 'মরমর দেউতা'য় কৈশোরের যে টানাপোড়েন ও সংকটের কথা উঠে এসেছে, এই গবেষণায় তার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

কৈশোর, একাকীত্ব, মনস্তত্ত্ব, ডিটেলস, বিশ্বাস

ভূমিকা

ছোটদের মন ও মনন গঠনে অপরিসীম ভূমিকা থাকে সাহিত্যের। তবে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে শিল্প-সাহিত্যের রূপগত,ভাবগত, আঙ্গিকগত বদলের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেছে শিশু-কিশোর সাহিত্যের ফর্মটাও। উঠে এসেছে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা। রূপকথার রহস্যময় আলো আঁধারির বদলে সায়েন্স ফিকশনেই মগ্ন হতে স্বচ্ছন্দ জেনারেশন 'জেড'। তাই শিশু বা কিশোর সাহিত্য মানে আর 'সদা সত্য কথা কহিবে' বা 'চুরি করা বড় দোষ' মাত্র নয়। মনের ভেতর যে ভালো দিকগুলি ঘুমিয়ে আছে, তাদের পুষ্ট করাও। মর্যাদা দেওয়া তাদের ভাবনা চিন্তা, জীবন সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকেও। আজকের যুগটা, "...treat children as adults as equals"[১] এর। স্বাভাবিকভাবেই শিশুর ভালোলাগা-মন্দলাগা, কৈশোরের অনিশ্চয়তা, মনস্তাত্ত্বিক ওঠাপড়া নিয়ে বিস্তৃত হয়েছে এর পরিসর। ছোটদের বিশ্বাসটাকে ধরে রাখতে চাইলে যেটা সবচেয়ে জরুরি সেটা হলো, সেই বিষয়ের উপর লেখকের বিশ্বস্ততা। শিশু পাঠকের সেই বিষয়ের সঙ্গে কমিউনিকেট করাটা

চাইই- চাই। তাই দেখি ছোটা ভীমের পাকামি থেকে ঘুমকাতুরে নোবিতার আলসেমি বা শিনচ্যানের দুরন্তপনায় শিশু মন তো বটেই, আমরা প্রাপ্ত বয়স্করাও আকৃষ্ট হই অনেক বেশি। আমরা মারাত্মক ভুল করব যদি ভাবি যে শিশু সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপদেশ বিতরণ। সাহিত্যরসের উপস্থিতি সেখানে থাকতেই হবে। কারণ আনন্দ রসের সঞ্চার হয় এই সাহিত্য রসের হাত ধরেই। সাহিত্যের রস, ভাব বা বিষয় উপভোগে তারতম্য আসতেই পারে বয়স হিসেবে, কিন্তু তার সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার একটা ক্ষমতা থাকা চাই, "যথার্থ শিশু সাহিত্য বলিতে তাহাই বুঝিব, যাহা সর্ব বয়সের নর-নারীর কাছেই একটি রসাস্বাদ আনিয়া দেয়; বয়সের পার্থক্য অনুসারে আস্বাদনের ব্যাপারে কিছু বিভিন্নতা ঘটিতে পারে-কিন্তু সর্বস্তরের মানুষকে আনন্দ দান করিবার মতো শিল্পগুণ তাহাতে থাকিবেই।"[২]

আর এইজন্যই শিশু বা কিশোরকে তার সমস্ত দোষগুণ নিয়ে সাহিত্যে তুলে ধরাটা অত্যন্ত কঠিন। এখানে গোঁজামিলের কোনো অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে আমরা যেমন উল্লেখ করতে পারি সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'পাগলা দাশু', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টেনিদা' বা সত্যজিৎ রায়ের 'ফেলুদা'র; অসমিয়া সাহিত্যে তেমনি তুমুল উপস্থিতি ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার।

উদ্দেশ্য

শিশু সাহিত্য পড়ার একটা সুস্থ, স্বাভাবিক সংস্কৃতি আমরা হারিয়েছি বহুদিন। পাঠ্যসূচিতে যা আছে, পরীক্ষার খাতায় তা কতোটা উগড়ে দেওয়া যায় চারপাশে তারই প্রতিযোগিতা। সাহিত্যের সঙ্গে সখ্য, গল্পের প্রতি আগ্রহ শিশুমনে জন্ম নেয় বাড়ির বড়োদের কাছ থেকে গল্প শুনেই। খাটের নিচে শুয়ে বই পড়া বা পড়ার বইয়ের মাঝখানে গল্পের বই রেখে গোগ্রাসে শেষ করার কথা ভাবতেই পারেনা 'ব্লু হোয়েল' আর 'রিল'-এ ডুবে থাকা আজকের প্রজন্ম। কল্পনা প্রবণ নিষ্পাপ মনগুলি মোবাইল,ল্যাপটপ, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইন্সট্রাগ্রামের গণ্ডিতে জড়িয়ে গেছে আপাদশির। সত্যি বলতে আজ আর কোনো টমটম কোথাও নেই। আসলে শিশুর শারীরিক এবং শৈক্ষিক বিকাশ নিয়ে আমরা যতটা চিন্তিত, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ততটা মোটেও নয়। আমাদের এটা বোঝা জরুরি যে আজকের শৈশব যদি সঠিকভাবে লালিত না হয় তাহলে আগামী সমাজ নড়বড়ে হতে বাধ্য। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার পরিচয় নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্র নির্দেশক বা চিত্রনাট্যকার হিসেবেই সীমাবদ্ধ নয়। শিশু সাহিত্যিক হিসেবেও অসমিয়া সাহিত্যে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। নিষ্পাপ শৈশব এবং অনিশ্চিত কৈশোরের ছবি আঁকাতেও তিনি ছিলেন দ্বিতীয় রহিত। 'মরমর দেউতা' উপন্যাসে কৈশোরের যে টানাপোড়েনকে তিনি তুলে ধরেছেন, তার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা করাই আলোচ্য গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণা পত্রে মূলত বর্ণনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশ্লেষণ

১৮৮৯ সালে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'জোনাকি' পত্রিকার হাত ধরে স্থাপিত হয় অসমিয়া শিশু সাহিত্যের প্রথম ভিত। তাঁর 'জুনুকা','বুঢ়ী আইর সাধু', ককা দেউতা নাতি লরা' অসমিয়া শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এরপর একে একে আসেন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ('কম্পুর সপোন', 'অকণমান লরা', 'অকনির সপোন'), রঘুনাথ চৌধুরী ('আমার গাঁও', 'ঈশ্বর'), লক্ষ্যধর চৌধুরী ('মোর লক্ষ্য')। ১৯৪৬ সালে প্রথম অসমিয়া সাময়িক পত্র 'অরুনোদয়' আত্মপ্রকাশ করে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নীতি গল্প ছাড়াও বাইবেলের শিশু উপযোগী কিছু গল্প এখানে নিয়মিত প্রকাশিত হতো ('বাইবেলর সাধু', আফ্রিকার কোঁয়র', 'মাউরী ছোয়ালী','ঈগলর বাহ')। প্রায় এই সময়েই লেখালেখির জগতে আসেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। তাঁর 'অসমিয়া লরার মিত্র', বলদেব মহন্তের 'উজু পাঠ,' দুর্গাপ্রসাদ মজিন্দার বরুয়ার, 'ফুল', 'লরা'এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। স্বাধীনোত্তর পর্বে অসমিয়া শিশু সাহিত্যিক হিসেবে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'নীলা চরাই,' 'জাতকর সাধু', 'কথা কীর্তন'-এর লেখক অতুলচন্দ্র হাজারিকার। এছাড়াও বেণুধর শর্মা, বাণীকান্ত কাকতি, প্রসন্নকুমার ডেকা, নবকান্ত বরুয়া, মুক্তিনাথ বরদলৈ, নির্মল প্রভা বরদলৈ, অনন্তদেব শর্মা, যতীন গোস্বামী, সৌরভ কুমার চলিহার নাম এই পর্যায়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসমের শিশু উপন্যাসের ভিত সুদৃঢ় করে নবকান্ত বরুয়ার 'শিয়ালি পালেগৈ রতনপুর', 'ভ-ত ঊ-কারে ভূ', যোগেন শর্মার 'সুরুজ ওঠা দেশর পিনে', জোন জাক জাক তরা', হোমেন বরগোহাঞির 'সাউদর পুতেকে নাও মেলি যায়'। 'মরমর দেউতা'উপন্যাস নিয়ে এরপরেই আত্মপ্রকাশ করেন ড. ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া।

বেনজির কথনশৈলী, স্মার্ট শব্দচয়ন, অভিনব উপস্থাপনা, নিটোল রসবোধ নিয়ে ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়া শুরু থেকেই ছিলেন অগতানুগতিক। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব এবং অভিনব আঙ্গিক নিয়ে সমসাময়িক লেখকদের থেকে তিনি এগিয়ে গেছেন অনেকখানি। সংক্ষিপ্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক ভবেন্দ্রনাথের বড়ো সম্পদ। এবং যেটা সবচেয়ে অনবদ্য, সেটা হলো অতি নাটকীয়তার অভাব। Sensational বা melodramatic ব্যাপারটাই অপছন্দ ছিল তাঁর। ১৯৪৭ সালে 'উদয়' পত্রিকায় "পথ নিরুপম" গল্প দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরুয়াৎ। তবে রামধনু যুগের স্বনামধন্য এই গল্পকার উপন্যাস এবং নাটক রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অসমিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা 'প্রান্তিক' তথা কিশোর পত্রিকা 'সঁফুরা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. শইকিয়ার 'অগ্নিস্নান', 'কোলাহল', 'সন্ধ্যারাগ', 'অনির্বাণ'-এর হাত ধরে আমূল পাল্টে যায় অসমিয়া সিনেমা। চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন বলেই একটা সহজাত পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল তাঁর। ক্যামেরার পিছনে থেকে গোটা ফিল্মকে যেভাবে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা ছিল, ঠিক তেমনি লেখক হিসেবেও দৃষ্টি ছিল ছোট বড়ো প্রত্যেকটি জিনিসের উপর। শিশু মনস্তত্ত্বটা বরাবরই ভালো বুঝতেন ড. শইকিয়া। তাঁর প্রথম শিশু বেতার নাটক 'শান্তশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট মহা দুষ্ট' নাটকের, "কিয় নকম? মোর হলেও কম। আরু ডাঙর মানুহর কথা যদি কবই নালাগে, তেনেহলে তেওঁলোকে আমার আগত সেইবোর কাম করে কিয়? ভাবে চাগৈ, --এইবোর পোয়ালি পোয়ালি লরা, কি ডাল বুজে! আমি কিন্তু সব বুঁজো বুইছ!"[৩] -উক্তিতে বাপুর যে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকে তিনি তুলে ধরেছিলেন, 'মরমর দেউতা' (১৯৮৯ থেকে ১৯৯০, ধারাবাহিকভাবে 'সঁফুরা' পত্রিকায় প্রকাশিত) উপন্যাসে তাই শীর্ষ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছে,– "বুঢ়া যাওক, তার পাছত মই তোক কি করোঁ চাই ল। মোতকৈও তোর চুলি চুটি হৈ যাব চাই থাকিবি।"[৪]

ছোট্ট প্রাণের অপরাজেয়তায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর সুকুমার রায়ের মতই। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে তিনি কখনো ভুলেননি যে তিনি তত্ত্ববিদ নন; মতাদর্শ প্রচার করতেও আসেননি। তাই 'ছোট্ট সোনা বন্ধু'রা মার্কা ন্যাকামি দিয়ে শিশু কিশোরদের মন ভোলানোর তাগিদে তাঁর কলম ধরা নয়। পূর্বসূরীদের ছক বাঁধা পথে ভবেন্দ্রনাথ শুরু থেকেই হাঁটতে অস্বীকার করেছেন,

"অসমর মানুহর মতে হেনো শিশু সাহিত্যিক হোয়ার দরে উজু কাম নাই। দুটামান সাধুকথা লিখিয়েই 'লেবেলটো' কপালত মারি লব পারি। চরকারর ঘরলৈ সাহিত্যিক পেনশনর বাবে অহা-যোয়া করিব পারি। আচলতে ই এক বর জটিল কাম। শিশুর মনর খবর বুটলিব নোয়ারিলে আগবাঢ়ি নোহাই ভাল। কেবল সাধুকথাই আজির শিশুর মন ভরাব নোয়ারে। আজির শিশুয়ে আরু বহু কিবা কিবি বিচারে। আজির শিশু সাহিত্যিক অতীতমুখী হলে নহব। ভবিষ্যৎমুখী হব লাগিব। আজির পরা ৪০-৫০ বছরর আগর মানসিকতারে আজির চামর সমস্যার বুজ লবলৈ যোয়াটো এক মারাত্মক ভুল হব।"[৫]

১৯৮১ সালে সুদেব রায়চৌধুরীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঠিক একই কথা জানিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়,– "লে-আউট, ছাপা, ছবি, যেমন সুন্দর হওয়া দরকার তেমনি এর লেখাগুলিও হবে শিশু কিশোর মনের উপযোগী.... ছোটদের লেখার একটি প্রধান ও প্রচলিত সংজ্ঞা হল, এটি সব বয়সী পাঠক পাঠিকাকে সমানভাবে আকর্ষণ করবে।"[৬]

'শাখা প্রশাখা' সিনেমায় আনন্দমোহনকে যখন তার নাতি প্রশ্ন করেছিল, "আমি এক নম্বর দু'নম্বর জানি, দাদু তুমি কত নম্বর? তিন নম্বর? চার নম্বর?"[৭] অস্থির আনন্দমোহনের তখন চোখ বোজা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সেই সঙ্গে থমকে গিয়েছিল আমাদের সততার প্রশ্নও। সত্যজিতের এই দেখা এবং দেখানোর দৃষ্টিকোণে 'শাখাপ্রশাখা' মুহূর্তেই হয়ে উঠে 'The best human document'। ভবেন্দ্রনাথের 'অগ্নিস্নান' বা 'কোলাহল' সম্পর্কেও কিন্তু আমরা একই কথা বলতে পারি। সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও যে ডিটেলিং এর কাজ করে তামাম বিশ্বকে সেটা শিখিয়েছিলেন সত্যজিৎ। তাঁর সাহিত্যরীতি বরাবরই চিত্রধর্মী। চরিত্র ও ঘটনার ভিসুয়াল ট্রিটমেন্টে তিনি ভীষণ সাবলীল। তাঁর গল্পগুলি আমরা যে শুধু পড়ি তা নয়, গল্পের দৃশ্যগুলিকে দেখি অনেকটা সিনেমা দেখার মতই। উদাহরণ হিসেবে 'দেবী'র কথাই ধরা যাক। সাধারণ এক গৃহবধূ থেকে কালীর অবতার, দয়াময়ীর এই রূপান্তরের জন্য দুটি দৃশ্য ব্যবহার করেননি শ্রী রায়। একটিমাত্র স্বপ্নই যথেষ্ট ছিল। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিনেমায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে একটিমাত্র বিকেলের পথ চলতি কথাবার্তায় সত্যজিৎ যেমন তুলে আনেন, তেমনি গল্পেও কোথায় থেমে যেতে হয় খুব ভালো করে জানতেন তিনি। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ অরুণবাবু যখন জানতে চাইলেন ফেলুদা শিকার করে কিনা, সে উত্তর দিচ্ছে "শুধু মানুষ।"[৮] মাত্র দুটি শব্দ. অথচ কী সুদূরপ্রসারী তার বিস্তার! ডিটেইলিং-এর এই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ভবেন্দ্রনাথেরও। একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়,–

"ডিটেলছর সূক্ষ্মতম কারুকার্যর বাবে ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার গল্প পঢ়ি পোয়া যায় একেটা সোয়াদ, একেটা কারণতে।"[৯]

চলচ্চিত্র নির্দেশক ছিলেন বলেই ভবেন্দ্রনাথকে যেমন বহু লোকের সঙ্গে মিশতে হতো, তেমনি ছবির শুটিংও

হতো নানান জায়গায়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসকে মনে রাখার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর। আর তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আটপৌরে লোকগুলি-বিপুল, রানী, রিণী, বাবা-মা ,সদানন্দ দত্ত, মৃণালিনী, ময়িদুল তাঁর সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। একইসঙ্গে নিজস্ব রূপ রস গন্ধ স্পর্শ নিয়ে ধরা দিয়েছে অসমিয়া সংস্কৃতি, অসমিয়াদের যাপনচিত্র। ধর্মীয় রীতি-নীতি, সংস্কার থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ কিছুই এড়িয়ে যাননি তিনি। তাঁর পরিচ্ছন্ন মনের ছাপ 'অগ্নিস্নান', 'কোলাহল' ইত্যাদি সিনেমায় যেমন রয়েছে তেমনি উপলব্ধ হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। শৈশব, শিশুদের মনোজগত নিয়ে অবসেসিভ একটা উদ্বেগ বরাবর ছিল ভবেন্দ্রনাথের। কৈশোর স্নবারি মুক্ত থাকুক এটা আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন বলেই বিপুলের উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে immune force বলে এড়িয়ে যেতে তিনি চাননি। Juvenile deliquency কে স্পর্শকাতর বিষয় বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। আর তাই প্রয়াস করেছেন সমস্যার গভীরে যাওয়ার। বিপুলের একাকীত্বের যে যন্ত্রণা, তার অংশীদার হওয়ার। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, তাঁর সৃষ্টিকর্মের কোথাও কোনো উপদেশ নেই। শৈশব-কৈশোরের বিন্যাসে তার নিশ্চিতি আমাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ।

ভবেন্দ্রনাথ জানতেন, শিশুমন মারাত্মক কৌতূহলী। ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা থাকে না বলেই খেই হারাতেও এই বয়সে মুহূর্ত লাগে না। 'পথের পাঁচালী'র অপুকে আমরা দেখেছিলাম যে পৃথিবীর সবটুকু জানতে চায়, বুঝতে চায়। 'শাখা প্রশাখা' সিনেমায় তেমনি টয়গান হাতে দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বড়োদের চলতি আলোচনা শোনা এবং মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা আসলে শিশু মনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ইঙ্গিত দেয়। ছোটদের কল্পনাপ্রবণ এই মনটাকে বোঝার ক্ষমতা বা মানসিকতা বড়দের প্রায়ই থাকে না। আমরা আমাদের প্রাপ্ত বয়স্কের পৃথিবীতে ওদের কিছুতেই ঢুকতে দেই না। আবার ওদের অনুভূতি, কল্পনা, রাগ, স্বপ্ন বা আবেগকেও ভাগ করে নিতে আমাদের কষ্ট হয়। তাই স্বাভাবিকভাবে কচি মন গুলি হয়ে পড়ে বড্ড একা। এই একাকীত্বের হাত থেকে রক্ষা পেতে কেউ রুকুর ('জয় বাবা ফেলুনাথ') মতো মারাত্মক পথ বেছে নেয়। সুপারসেন্সিটিভ সদানন্দের মতো ('সদানন্দের খুদে জগত') কেউ বা আবার নিজের বিধ্বস্ত মনকে আনন্দ অসুখে সমর্পণ করে। আর্য শেখরের ('আর্যশেখরের জন্ম মৃত্যু') মতো কেউ আবার তৈরি করে নেয় নিজস্ব জগত। কারো মধ্যে অজান্তেই জন্ম নেয় এক ধরনের ক্রিমিনাল মাইন্ডসেট ('মরমর দেউতা')।

বিপুলকে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে তার পারিবারিক পটভূমি। কর্মসূত্রে বিপুলের বাবা থাকেন প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরের পাহাড়ি এক অঞ্চলে। বাড়ির বড়ো ছেলে বিপুল। দিদি রানী, বোন রিণী এবং ছোট ভাই মুকুল সবাই খুব অমায়িক। বিপুল একেবারে অন্যরকম। একগুঁয়ে,অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল। বাবার অনুপস্থিতিতে এমনিতেই সে নিরাপত্তা জনিত অভাবের শিকার। তার ওপর চলছিল বয়ঃসন্ধির শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন। বিপুলের জীবনের এই জটিলতম সময়টিকে অনুভব করার মানসিকতা তার মায়ের ছিল না। সময়ও তিনি পেতেন না। ভবেন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে ধরা পরেছে সবটুকুই,–

"বিপুলর মাক এইবার জিকাটোর শিরবোর চুঁচিবলৈ আরম্ভ করিছে, এনেতে চৌকার ফালর পরা চোঁ-চোঁ শব্দ এটা আহিল। গাখীরখিনি উতলি উফন্দি উঠিছে, অকনমান গাখীর চছপেনটোর কাষেদি বাগরি আহিলেই। জিকা- কটারি এরি বিপুলর মাক দৌরি গল চৌকার ওচরলৈ। খটপকৈ শলিতা কমোয়া হেন্ডেলডাল তললৈ

হেঁচি দি তেওঁ ফু- ফুকৈ নুমুয়াই দিলে... তার পাছত আকৌ জিকার ওচরলৈ আহিল।"[১০]

-এমন অবস্থায় বিপুলের জীবনটা যতটা স্বাভাবিক হবার ততটাই স্বাভাবিক। সে বুঝতে পেরেছে এতখানি একাকীত্ব, এতদূর অনিশ্চিতি নিয়েই তাকে চলতে হবে আজীবন। বিপুলের অব্যক্ত অভাববোধ, অসহায়তাই উপন্যাসটির নির্যাস। কী যে তার কষ্ট, কোথায় যে তার ব্যথা সে কাউকে বোঝাতেই পারেনি। নিঃসঙ্গ বিপুল সকাল থেকে রাত অবধি টোটো করে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। খেতে ডাকলে আসে না। ঘুম থেকে উঠতে বললে মেজাজ দেখায়, "যেতিয়া মন যায় উঠিম নহয়।"[১১] অনিয়মিত হয়ে আসে স্কুলে যাওয়া, "মই স্কুল নাযাওঁ বুলি কৈছো নহয়।"[১২] ছোট ভাইবোন, মা-বাবা সকলেই তার ব্যবহারে তটস্থ সারাক্ষণ, "মোর কিতাব বহী তই চুবি কিয়?--বুলি টেঁটুফালি চিঞৰি বিপুলে গিলাছটো রাণীর গালৈ জোরেরে মারি পঠিয়ালে।"[১৩] দিন দিন তার ব্যবহার লাগামহীন ঘোড়ার মতো হতে শুরু করে। অনুশাসন সে মানতে নারাজ। কাউকে সম্মান দিতে চায় না। দুলাল, কার্তিক আর ময়িদুলের সাহচর্যে সে কিছুটা আরাম পায়। সিগারেটের ধোঁয়ায় জীবনের আস্বাদ খোঁজে। আলমারি থেকে টাকা সরায়। বাবার কিনে দেওয়া বেল্ট ১০ টাকায় ময়িদুলকে বেচে দেয়। মেটিনি শো তে সিনেমা দেখে। 'মনছুন' নামের টি স্টলে বসে মাটন চপ আর চা খায়। কৈশোরের এই নড়বড়ে সময়টাকে অবিকল আঁকছেন ভবেন্দ্রনাথ–

"বহীবোরত মলাটো নাই, লেবেলো নাই। এইখন বহীত এয়া অঙ্ক করার চিন আছে, মানে অঙ্কর নামত কিবা কিবি লিখি কাটি থোয়া আছে। কিন্তু তার পিছত পাতখিলাত দেখোন কিবা গান লিখা আছে! মেহবুবা! মেহবুবা..।"[১৪]

-বয়ঃসন্ধির ট্রানজিট পিরিয়ডের এই হুবহু ছবি বিপুলের সঙ্গে পাঠকের কমিউনিকেশন বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকখানি।

বিশ্বের কাছে নিজেকে প্রেজেন্টেবল করে উপস্থিত করাটা বয়ঃসন্ধির একটা অবসেশন। সত্যজিতের রুকু সেই জন্যই সুপারম্যান হতে চায়। ঠিক রুকুর মতো না হলেও বিপুলও এর ব্যতিক্রম নয়। উঠতি বয়সী পুত্রের জন্য চিন্তিত ছিলেন তার বাবা। কথা প্রসঙ্গে বন্ধু সদানন্দ দত্তকে সব খুলে বলেন। সদানন্দ দত্ত তাকে 'পলাশনী আই'র বিধি মতো পূজো করতে পরামর্শ দেন। যার জন্য তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি আসেন বিপুলের বাবা। 'পলাশনী আই'র পূজোর অঙ্গ হিসেবে বিপুলকে ছোট করে চুল কাটতে হবে। এদিকে 'টিপটপ' সেলুনে সেট করা কাঁধ অবধি বাহারি চুল কাটতে কিছুতেই রাজি নয় বিপুল। বাবা তাকে বোঝালেন যে নামমাত্র চুল কাটলেই হবে। যেহেতু বিপুলের নামে পুজো দেওয়া হচ্ছে, তাই বিপুলের একটুখানি কাটা চুল নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে। ওটাই পুজোর বিধি। বাবাকে বিশ্বাস করে চুল কাটতে বসে বিপুল। ভরত নাপিতকে বারবার সে বোঝায়, "অকণ অকণ কাটিবি। বেছি চুটি নকরিবি।"[১৫] বিপুলের বাবার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় ভরতের। তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন, "তই কাটি যা।"[১৬] কৌশলে বিপুলের প্রায় পনিটেলকে ছোট করে কেটে দেয় ভরত নাপিত। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে বিপুল ভরতের কাঁচি কেড়ে নিয়ে তাকেই আক্রমণ করে। মাকে শাসায়, 'বুঢ়া যাওক তার পাছত মই তোক কি করোঁ চাইল। মোতকৈও তোর চুলি চুটি হৈ যাব চাই থাকিবি।"[১৭] মায়ের সঙ্গে এই দুর্ব্যবহার, বাবাকে 'বুঢ়া' (বুড়ো) বলে সম্বোধন করা দেখে আমরা ধরেই নি যে বিপুলের মতো বখাটে ছেলে

আর দুটো হয় না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বাবার প্রতি থাকা কিশোর পুত্রের বিশ্বাসকে ভেঙে দেননি বিপুলের বাবা!!

অনাহুত এই পরিস্থিতির পর অন্যদিকে মোড় নেয় কাহিনি। একরাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বিপুলের পায়ে কেউ সজোরে আঘাত করে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। পুলিশ আসে। প্রথমে দোকানদার গণেশকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কারণ আক্রান্ত হওয়ার রাতে গণেশের সঙ্গে বিপুলের জোর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। কিন্তু বিপুলের বন্ধু ময়িদুলকে দোষী বলে ভুয়ো প্রচার করে পুলিশ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আসল অপরাধী কে খুঁজে বার করা। জেরা করা হয় বিপুলের সহজ সরল বাবাকেও। আর আসল সত্য বেরিয়ে আসে তখন। অবাধ্য, প্রায় বিগড়ে যাওয়া পুত্রকে রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে সেই রাতে বিপুলের পায়ে আঘাত করেছিলেন তার বাবাই। ভাবা যায়, একজন বাবা কতটা অসহায় হলে, কতটা কষ্ট পেলে এমনটা করতে পারেন! পুলিশের কাছে তিনি স্বীকার করেন,

"মই দূরত চাকরি করোঁ। সি মোর ডাঙর লরা। তাক যি লাগে মই সকলো দিছোঁ। মই বহুত টকা-পইচা থকা মানুহ নহওঁ।তথাপি তাক মই অভাবত রখা নাই। তার মনটো ভালে থাকিলে সি পঢ়া-শুনা করি ভাল লরা হব --সেই বুলিয়েই বাকী কেইটার মুখরপরা কাঢ়ি হলেও তাক মই যি লাগে দি আছোঁ। কিন্তু কথাবোর এনেকুয়া হলগৈ--মই যেন জ্বলা জুইত শুকান খরিহে জাপি আছো। মই তাক গাখীর খাবলৈ পইচা দিওঁ, সেই পইচারে সি খাব ছিগারেট।....সেইদিনা রেলত গৈ থাকোতে মোর মনটো বর অস্থির হৈছিল।মই অহার পিছত বা সি কি করে!তার চুলি কটার হোরটো যদি সি মাক-বায়েকহঁতর ওপরত তোলে! ভরতক যদি আকৌ মারে! এইবোর ভাবি মই আরু রেলত গৈ থাকিব নোয়ারিলো। এটা স্টেশনত নামি উভতি আহিলো। আন্ধার হোয়ার পাছত মই ঘুরি ঘুরি তাক বিচারি উলিয়ালো।তার পাছত যেতিয়া সি ছিগারেট হুঁপিবলৈ ধরিলে তেতিয়া আরু মই থিরেরে থাকিব নোয়ারিলো। বাঁহর টুকুরাটো ক'ত পালো মোর মনত নাই। মই, মই গার জোরেরে তার ঠেঙত কোব সোবালো।"[১৮]

-মধ্যবয়সী অসহায় বাবার এই হাহাকার হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকা বিপুলের বুকে গিয়ে বাজে বইকি। মা, বাবা, দিদি রাণী, বোন রিণী আর ভাই মুকুলের তার জন্য উৎকণ্ঠা, যেমন করেই হোক তাকে সুস্থ করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে অনুতপ্ত হয় সে। ভেতরটা হু হু করে ওঠে তার। সে বুঝতে পারে পরিবারের চেয়ে আপন আর কেউ হতে পারে না। ঠিক তখনই তার মনে পড়ে দিন কয়েক আগে মাকে বাবা বোঝাচ্ছিলেন,

"আচলতে সি বেয়া লরা নহয় বুইছা।তার মনটো বুজি, আমি তাক অলপ মরম করি চলাব লাগিব।অনবরত কেটকেটাই থাকিব নালাগিব।তারো কিছুমান চখ আছে।"[১৯]

-তাকে আনন্দে রাখার, ভালো ছেলে করে তোলার বাবার আপ্রাণ চেষ্টাটা বুঝতে পেরে বিপুল, 'বিছনাতে পোন হৈ বহিল। ডাঙরকৈ উচুপি- উচুপি সি বিছনার পরা নামিবলৈ চেষ্টা করিলে। ডাক্তরে তাক ধরি সহায় করি দিলে। বিপুলে দেউতাকর ভরির ওচরত মাটিতে বাগরি পরি হাও-হাওকে কান্দিবলৈ ধরিলে।....ডাক্তরে কলে, বেমার ভাল হোয়ার লক্ষণ দেখা গৈছে। সেইকারণে কান্দিছে।"[২০]

উপসংহার

সত্যজিতের মতোই কিশোর মনস্তত্ত্বটা খুব ভালো বুঝতেন ভবেন্দ্রনাথ। বিশ্বাস করতেন কিশোর মনের অপরাধ প্রবণতাকে গোড়া থেকে নির্মূল করতে না পারলে আগামী দিনের যৌবন আর বার্ধক্যকে বাঁচানো যাবে না। জীবনের পরিণামী ব্যঞ্জনা কখনোই অন্তিম অন্ধকার হতে পারে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত আস্থা ছিল তাঁর। আজকের এই অসুস্থ পৃথিবী নিশ্চয়ই সত্য কিন্তু শেষ সত্য নয়। ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বদলে যেতে পারে অনেক কিছুই,-"এই পথে আলো জ্বেলে এই পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।"[২১] চিরকালের এই বিশ্বাসে আস্থাবান ছিলেন ভবেন্দ্রনাথ সৌরভ কুমার চলিহার মতোই,

"আকৌ পাহারখনলৈ চালো এতিয়া প্রায় অদৃশ্য। আরু বেছি মেঘ জমা হৈছে। বতর সলনি হব ধরিছে। ভৃগু কুমারহঁত গৈ আছে আগুয়াই, বতর আহি আছে আমার অনুকূলে। আমার পাহার টিঙত মেঘ, আমার পথারত বরষুন।"[২২]

-'খরাং' গল্পে ভৃগুর এই এগিয়ে যাওয়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের' হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় বন্যার পর নতুন করে বাঁশবাদী গাঁয়ের পত্তন করার জন্য করালীর গাইতি চালিয়ে বালি কাটা আর মাটি খোঁজা, 'মরমর দেউতা'য় বিপুলের "বেমার ভাল হোয়ার লক্ষণ"[২৩] আসলে একই।

তথ্যসূত্র

১. রায়, সন্দীপ (সম্পাদনা); সত্যজিৎ রায় সাক্ষাৎকার সমগ্র, ফেব্রু ২০২০, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃ, ২৬৮।

২. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা; শিশু সাহিত্যের স্বরূপ-বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০); ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ; বই.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ, ৩০৪-৩০৫।

৩. শইকীয়া, ড. ভবেন্দ্রনাথ ; ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার শিশু- সাহিত্য সমগ্র; প্রথম প্রকাশ ২০০৬: বনলতা, গুয়াহাটি,পৃ, ৩৫৮।

৪. পূর্বোক্ত;পৃ, ৫২৮।

৫. পূর্বোক্ত; ভূমিকা।

৬. ভট্টাচার্য গোস্বামী, মহুয়া; বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তন ১৯৫০-২০০০, জানু, ২০১১, পত্রলেখা, কলকাতা, পৃ, ১৭।

৭. চৌধুরী, পার্থপ্রতিম; অতিকায় শাখা প্রশাখা (সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত সত্যজিৎ: জীবন আর শিল্প); প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬; প্রতিভাস, কলকাতা -২ ,পৃ, ৫৭১।

৮. রায়, সত্যজিৎ; 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ', ফেলুদা সমগ্র (১ম খণ্ড); প্রথম প্রকাশ ২০০৫; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা -৯, পৃ, ৬৬৩।

৯. বরা, মহেন্দ্র; এক জেনারেশনর গল্প লেখক; চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া সম্পাদিত,পৃ, ১৯৫।

১০. শইকিয়া,ড. ভবেন্দ্রনাথ; ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার শিশু-সাহিত্য সমগ্র; প্রথম প্রকাশ ২০০৬: বনলতা, গুয়াহাটি, পৃ, ৫০৯।

১১. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫০৮।

১২. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫১২।

১৩. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫১১।

১৪. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫০৯।

১৫. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫২৪।

১৬. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫২৪।

১৭. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫২৮।

১৮. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫৬৭-৬৮।

১৯. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫১৭।

২০. পূর্বোক্ত,পৃ, ৫৬৮।

২১. বসু, অম্বুজ; একটি নক্ষত্র আসে; প্রথম প্রকাশ ১৩৭৩: পুস্তক বিপণি, কলকাতা -১, পৃ, ১৭০।

২২. চলিহা, সৌরভ কুমার; নবজন্ম; প্রথম প্রকাশ ২০০৮; লয়ার্স বুক স্টল; গুয়াহাটি -১,পৃ, ২০।

২৩. শইকিয়া, ড.ভবেন্দ্রনাথ; ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়ার শিশু-সাহিত্য সমগ্র; প্রথম প্রকাশ ২০০৬; বনলতা, গুয়াহাটি,পৃ, ৫৬৮।

অসমিয়া উক্তিগুলির বাংলা ভাবানুবাদ

৩. কেন বলব না? আমার হলেও বলব। আর বড়ো মানুষের কথা যদি বলতেই না হয়, তাহলে তারা আমাদের সামনে সেসব কাজ করে কেন? ভাবে বোধহয়, –এরা ছোট ছোট ছেলে, কী আর বোঝে! আমরা কিন্তু সব বুঝি, বুঝলি!

৪. বুড়ো যাক,তারপর আমি তোর কী করি দেখতে থাক। আমার থেকেও তোর চুল ছোট হয়ে যাবে দেখে নিস।

৫. অসমের মানুষের মতে নাকি শিশু সাহিত্যিক হওয়ার মতো সহজ কাজ আর নেই। দু-একটা নীতিকথা লিখলেই 'লেবেলটা' কপালে লাগিয়ে নেওয়া যায়। সরকারের কাছে সাহিত্যিক পেনশনের জন্য আসা যাওয়া করা যায়। আসলে এটি একটি জটিল ব্যাপার। শিশুর মনের খবর সংগ্রহ করতে না পারলে এগিয়ে না আসাই ভালো। শুধু নীতিকথা আজকের শিশুর মন ভরাতে পারে না। আজকের শিশু সাহিত্যিককে অতীতমুখী হলে চলবে না। ভবিষ্যৎমুখী হতে হবে। আজ থেকে ৪০-৫০ বছর আগের মানসিকতা নিয়ে আজকের প্রজন্মের সমস্যা বুঝতে চাওয়াটা মারাত্মক ভুল হবে।

৯. ডিটেলসের সূক্ষ্মতম কারুকার্যের জন্য ভবেন্দ্রনাথ শইকিয়ার গল্প পড়েও পাওয়া যায় একই স্বাদ, একই কারণে।

১০. বিপুলের মা এইবার ঝিঙের শিরাগুলি চাঁচতে আরম্ভ করলেন। এমন সময় চুলোর দিক থেকে সোঁ সোঁ শব্দ একটা

এলো। দুধ উথলে উঠেছে। একটু দুধ সসপেনের গা বেয়ে পড়েও গেলো। ঝিঙে -দা ফেলে বিপুলের মা দৌড়ে গেলেন চুলোর কাছে। ঝট করে শলতা কমানোর হ্যান্ডেলটি নিচে ঠেলে তিনি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন। তারপর আবার ঝিঙের কাছে ফিরে এলেন।

১১. যখন ইচ্ছে হবে উঠবো তো!

১২. আমি স্কুলে যাব না বলে বলেছি না!

১৩. আমার বই খাতা তুই ধরবি কেন? বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠে বিপুল গ্লাসটা রাণীর গায়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলো।

১৪. খাতা গুলিতে মলাট নেই, লেবেলো নেই। এই খাতাটায় অঙ্ক করার চিহ্ন আছে, মানে অঙ্কের নামে কীসব লিখে কেটে রাখা হয়েছে। কিন্তু তার পরের পৃষ্ঠায় দেখি কোনো একটা গান লেখা রয়েছে! মেহবুবা, মেহবুবা!

১৫. একটু একটু কাটবি। বেশি ছোট করবি না।

১৬. তুই কাটতে থাক।

১৭. বুড়ো যাক তারপর আমি তোর কী করি দেখতে থাক। আমার থেকেও তোর চুল ছোট হয়ে যাবে দেখে নিস।

১৮. আমি দূরে চাকরি করি। সে আমার বড়ো ছেলে। তার যা লাগে আমি সব দিয়েছি। আমি প্রচুর টাকা-পয়সা থাকা মানুষ নই। তথাপি তাকে আমি অভাবে রাখিনি। তার মনটা ভালো থাকলে, সে লেখাপড়া করে ভালো ছেলে হবে -সেই জন্যই বাকি কয়টির মুখ থেকে কেড়ে নিয়েও তাকে আমি যা লাগে দিচ্ছি। কিন্তু কথাগুলি এমন হলো আমি যেন জ্বলন্ত আগুনে শুকনো খড়ি দিয়ে যাচ্ছি। আমি তাকে দুধ খাবার টাকা দিলে সেই টাকায় সে খায় সিগারেট। সেদিন রেলে যাওয়ার সময় আমার মন খুব অস্থির ছিল। আমি আসার পর বা সে কী করে! তার চুল কাটার শোধ যদি সে মা দিদিদের ওপর তোলে! ভরতকে যদি আবার মারে! এইসব ভেবে আমি আর রেলে যেতে পারলাম না। একটা স্টেশনে নেমে ফিরে এলাম। অন্ধকার হওয়ার পর আমি ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বের করলাম। তারপর যখন সে সিগারেট ধরালো তখন আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। বাঁশের টুকরোটা কোথায় পেলাম আমার মনে নেই। আমি, আমি গায়ের জোরে তার পায়ে কোপ বসালাম।

১৯. আসলে সে খারাপ ছেলে নয় বুঝলে। তার মনটা বুঝে আমাদের তাকে অল্প আদর করে চালাতে হবে। অনবরত খিটখিট না করাই ভালো। তারও কিছু শখ আছে।

২০. খাটে সোজা হয়ে বসলো। জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে খাট থেকে নামার চেষ্টা করল। ডাক্তার তাকে ধরে সাহায্য করলেন। বিপুল বাবার পায়ের কাছে মাটিতে বসে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। ডাক্তার বললেন, অসুখ ভালো হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেই জন্য কাঁদছে।

২২. আবার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এখন প্রায় অদৃশ্য। আরও প্রচুর মেঘ জমা হয়েছে, আবহাওয়া বদলাতে শুরু করেছে। ভৃগু কুমাররা এগিয়ে চলেছে ,আবহাওয়া আসছে আমাদের অনুকূলে। আমাদের পাহাড়ের চূড়োয় মেঘ, আমাদের মাঠে বৃষ্টি।

২৩. অসুখ ভালো হওয়ার লক্ষণ।